Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 100–107
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

ড. মানিক মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ
ই-মেইল: manikmodal079@gmail.com

Keyword
রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃত শিক্ষা, মানব-কল্যাণ, বিদ্যা, ইংরেজি শিক্ষা, শিল্প, চিত্রকলা, সংগীত

Abstract

Discussion
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনা দৃঢ়-সংকল্পিত হওয়ার পিছনে একদিকে যেমন ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশে নীরস বিদেশী শিক্ষার তুলনায় দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী হয়েছিলেন তেমনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের 'তত্ত্ববোধনী পাঠশালা' এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' নামক বিদ্যালয়ের দ্বারা কলকাতায় বাংলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম থেকেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি কাজ করছিলো। এছাড়া জমিদারির দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে পল্লীজীবনের শিক্ষাবিহীন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, কুসংস্কার, মহাজনদের দ্বারা শোষণ ও অন্যায়-ব্যবহারের পাশাপাশি তিনি লক্ষ করেছেন যে, গোটা দেশের বৃহত্তর অংশ যে পল্লীসমাজ; তাদের যাবতীয় দুর্দশার পিছনে-সর্বোপরী দেশের পরাধীনতার পিছনে অশিক্ষাই প্রধান কারণ। স্বদেশী-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার সময়ে যখন ইউনিভার্সিটি বিল প্রবর্তনের দ্বারা ইংরেজ কূটনৈতিক শাসক এদেশের প্রগতিশীল বাঙালি জাতির উচ্চশিক্ষার পথে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে; তখন রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন; তেমনি বিজাতীয় মানবতাহীন শাসকের প্রতি ভরসা না করে স্বদেশের জনদরদী মানুষদের গঠনমূলক-কর্মোদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিজাতীয় শাসকদের অন্যায় নীতির উপর ভরসা না করে তিনি দেশবাসীর শিক্ষার জন্য, তথা স্বজাতির শিক্ষার বিষয়ে দেশের মানুষের আত্মনির্ভরশীল উদ্যোগের নানান পরিকল্পনা করেন, যা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'স্বদেশী সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ক. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল লক্ষ্য :
রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃত শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল মানব-কল্যাণ। মানুষ যখন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হবে, পরস্পরকে ভালোবাসবে ও তাদের মঙ্গল-কামনা করে-তখনই তাকে বলে মনুষ্যত্বের বিকাশ তথা

মানুষের আত্মিক-জীবনের মূলগত উন্নতিসাধন। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় যে-শিক্ষা লাভ হয় তা মূলতঃ আধ্যাত্মিক শিক্ষা-উপনিষদের ভাষায় যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিদ্যা'। এই বিদ্যার দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন হয় ঠিকই; কিন্তু সঠিক পরিকাঠামো ও অর্থের অভাবে শরীর ও জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই তিনি মনে করেছেন যে, ভারতবর্ষের শিক্ষা পূর্ণশিক্ষা নয়। অন্যদিকে ইউরোপে যে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা প্রচুর ধনের মালিক হয়ে উঠেছে; তাকেও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাষায় বলেছেন 'অবিদ্যা'। এই অবিদ্যা ইউরোপকে হয়তো প্রচুর অর্থপ্রদান করেছিলো এবং মানুষের শরীর ও জীবনের উন্নতি প্রদান করেছিলো ঠিকই; কিন্তু সেই ধন তাদের শান্তি দিতে পারেনি। কেননা, সেই শিক্ষা তাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার লোভকে কেবলমাত্র বাড়িয়েই তুলেছিলো। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইউরোপের ধন হল কুবেরের ধন; তাতে লক্ষীর শ্রী অর্থাৎ কল্যাণ ও সৌন্দর্য কিছুই নেই। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে ইউরোপের শিক্ষাও অপূর্ণ। তিনি চেয়েছিলেন এই উভয় দেশের শিক্ষার মিলন ঘটাতেঃ

> "...এই জন্যই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।"[১]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল লক্ষ্য ছিলো মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, ইংরেজ সরকারের এদেশের প্রতি শিক্ষার উদ্দেশ্য হল- এদেশের মানুষকে কিছু কিছু মানুষকে ইংরেজ-ভক্ত কেরানিতে পরিণত করা এবং দেশের বৃহত্তর অংশকে স্বার্থ ও শোষণের এবং শাসনের সুবিধার জন্য অশিক্ষার অন্ধকারে ফেলে রাখা। তাই ইংরেজ-শাসকের শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ছিলো অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই তিনি নানান প্রবন্ধ-নিবন্ধে ইংরেজ-শাসকের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার পরিবেশ তথা বিষয় ও পদ্ধতি এবং শিক্ষার মাধ্যমের নানান দিকগুলি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ছিলো খুবই অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, ইংরেজ শাসক প্রবর্তিত ভারতবর্ষের ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা দেশের বিত্তশালী ঘরের সন্তানেরাই তাতে লাভোবান হতো এবং পল্লীর সাধারণ মানুষের শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ তাতে ছিলো না। ফলে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শহরের মানুষেরা ভদ্রলোক এবং ইংরেজি না-জানা গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ-এই দুই ধরনের মানুষ আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিলো। কাজেই শিক্ষার সুযোগের ফলে শহরের মানুষ লাভ করেছিলো চাকরি, অর্থ, স্বাস্থ্য- সমস্তকিছু। অপরদিকে শিক্ষার অভাবে গ্রামের মানুষ নিমজ্জিত হয়েছিলো অজ্ঞতার অন্ধকারে এবং সমাজের শক্তিশালী সম্প্রদায়ের শোষণ ও নীপিড়নের শিকার হয়ে পড়েছে পদে পদে। আর এর ফলেই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার গ্রামে দেখা দিয়েছিলো অন্ন, স্বাস্থ্য, জল, পথ-ঘাট প্রভৃতির নানান অভাব ও সমস্যা। তাই রবীন্দ্রনাথ দেশের বৃহত্তর অংশের এই দুঃখ-দুর্দশার কথা তথা শাসকের এই অন্যায় শাসন-নীতির বৈষ্যম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নানা প্রবন্ধে। এই বিষয়ে তিনি 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'সম্ভাষণ শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), 'অভিভাষণঃ শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'পল্লীসেবা' (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ), 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), 'শিক্ষার বিকিরণ' (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি প্রবন্ধে বার বার বলেছেন।

এছাড়া তিনি লক্ষ করেছেন যে, ইংরেজি-শিক্ষার সঙ্গে বাঙালির জীবনের তেমন কোনো যোগ ছিলো না বললেই চলে; আর পল্লীজীবনের সঙ্গে তো ছিলোই না। কেননা, তখন সেই শিক্ষায় বাঙালি-ছাত্রদের পড়ানো হতো ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য ও বিদেশের ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি এবং সে-শিক্ষা ছিলো সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির আঙিনা থেকে বিচ্যুত যান্ত্রিক ধরনের। সেই আনন্দহীন শিক্ষার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের', 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'বিশ্বভারতী-১' প্রভৃতি প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।কাজেই বিচিত্রমুখী শিল্প, চিত্রকলা, সংগীত-প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যে আনন্দের শিক্ষা-তা এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছিলো না।

খ. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার ক্রম-বিবর্তন :

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার যে ক্রম-বিবর্তন লক্ষ করা যায় তা হল-

প্রথমত, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ গঠনের প্রথম যুগ। এই পর্বে তিনি ব্রিটিশ-উপনিবেশ প্রবর্তিত প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তপোবনের প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সঙ্গে তাঁর ভাবনার প্রকাশ এবং তা নিজের পরিবারে ও ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করেন। ব্রহ্মচর্য-আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের মনকে সম্পূর্ণরূপে গঠন করে তাকে সমাজের অঙ্গীভূত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। কেবলমাত্র জ্ঞান বা মনের চর্চা নয়; মনুষ্যত্ব ও সামাজিকবোধের উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলো। তপোবনের ধারণা ও তার প্রয়োগ থেকে রবীন্দ্রনাথ কখনোই একেবারে সরে আসেননি। আশ্রমের মাধ্যমেই পরিপূর্ণ শিক্ষা ও আত্মকর্তৃত্বের চর্চা করা সম্ভব-এই ভাবনা দৃঢ়-প্রত্যয়ের সঙ্গে মেনে চলেছেন।[২ক] তাছাড়া তিনি শিক্ষার বৃহত্তর দিকটি নিয়ে নানান চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন এবং স্বদেশ-চিন্তার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এই সময়ে (১৯০৫ সালের ২২ অক্টোবর) তৎকালীন বাংলার প্রধান সরকারী সচীব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বদেশী-আন্দোলনে যোগদান বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি করলে দেশে বিদেশী-শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধ-অনুকরণে বিরুদ্ধে মত প্রকাশ ঘটে- যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঐক্যমত প্রকাশ করলেন।[২খ] একইসঙ্গে তিনি যে-জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে জোড়ালো যুক্তি পেশ করেন- তা ছিলো আত্মশাসন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে যুক্তিপূর্ণ ও বিকাশ ঘটানোর স্বাধীনচেতা মননের সম্পূর্ণ ভাবনার প্রকাশ। সেই সঙ্গে স্বদেশী চেতনা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মত প্রকাশ ও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা রচনায় উদ্যোগী তিনি হয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি তপোবন ও আশ্রম-শিক্ষাভাবনার পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে মানুষের মন গঠন, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের আদর্শ-রূপ-কল্পনা, শিক্ষাব্যবস্থার নানান খুটিনাটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও মতপ্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি এই পর্বেই তিনি সংকীর্ণ-মানসিকতা, মন গঠনে জাতীয়-চেতনার সীমাবদ্ধতা, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ও বিশ্বজনীনতার স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মননের মিলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২গ]

তৃতীয়ত, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ জাতীয়-শিক্ষা ও ইংরেজি-শিক্ষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, ব্রিটিশ সরকার জাতীয়-শিক্ষার নামে কেবল বিদেশী-শিক্ষার অনুকরণে আমাদের জাতীয় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখেছে। এছড়া এই-পর্বে তাঁর বিশ্বভারতীর রূপকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে একাধারে তিনি জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চা করার মধ্যে দিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, সমবায়-নীতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।[২ঘ] এই পর্বেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাজের কেন্দ্রস্থল অধিকার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং অধীত-জ্ঞানকে সমাজের কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন।[২ঙ]

চতুর্থত, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে তিনি লোকশিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন এবং বিশেষ করে শিক্ষাকে সর্বস্তরে প্রসারিত করার ব্যর্থতা নিয়ে মত প্রকাশ করেছেন।[২চ] শিক্ষাব্যবস্থায় যে অসাম্য জাতীয়-জীবনে জড়িয়ে রয়েছে, তা দূরীভূত করে শিক্ষাকে সমাজের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন।[২চ] এই পর্বেই তিনি পল্লীপুনর্গঠনের সঙ্গে শিক্ষার বিকিরণের চিন্তাকে যেমন রূপদান করেছেন, তেমনি দেশীয় ক্ষুদ্রশিল্পের চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রসারের বিষয়টিও শিক্ষার সঙ্গে সমান গুরুত্ব প্রদান করেছেন।[২ছ]

গ. ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি :

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার গ্রাম-বাংলায় সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করতে চায়নি মূলত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের শাসন ও শোষণের গতি অব্যাহত রাখার জন্য। কেননা, ব্রিটিশ সরকার জানত যে, এদেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তুললে এদেশের পরাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে পারা যাবে না। এছাড়া এই অনীহার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীসমাজে শিক্ষাবিস্তারের

বিষয়ে এদেশীয় তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজের গরজের অভাবও তখন সমান-মাত্রায় ছিলো। এই দ্বিমুখী অনাগ্রহ রবীন্দ্রনাথের বুঝতে বাকি থাকে নি। তাই তিনি বলেছেন-

> "এই জন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানারকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনোজল ঢোকানোর কাজটা ভালো নয়-শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার এদেশকে শাসন করার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসাবে মনে করে যে-কোন উপায়ে এদেশের মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে খর্ব করার নানান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি শিক্ষার ব্যাপারে এদেশের মানুষের স্বাধীনতাও নানান দিক দিয়ে খর্ব করার জন্য ইংরজ-শাসক উদ্যোগী হয়েছে। শিক্ষাকে এদেশকে শাসন-করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছে ইংরেজ সরকার।

তাছাড়া ইংরেজ সরকার এদেশে শিক্ষাকে মাধ্যম হিসাবে যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমের উপর গুরুত্ব দিয়েছে- তা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। কেননা, তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজ সরকার কূট-কৌশলে পল্লীবাংলাকে শিক্ষিত করে না-তোলার জন্যই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে। কেননা, বিদেশী ও বিজাতীয় ভাষা সবাই আয়ত্ত করতে পারে না তাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যদিও-বা পল্লীর মানুষেরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে, তবুও তারা শিক্ষা-গ্রহণের ক্ষেত্রে অনাগ্রহী হবে। কাজেই শিক্ষার যথাযথ বিস্তার ঘটবে না এবং এর ফলে ব্রিটিশ-শসকের সাম্রাজ্যবিস্তার ও শোষণের সুবিধা হবে-

> "বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি।"[৪]

ব্রিটিশ সরকারের তএই কূট-কৌশলী শিক্ষানীতি তথা শাসন-নীতির বিষয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে সজাগ করতে চেয়েছেন। কেননা, দেশের ভালো-মন্দ সবসময়ই দেশের পল্লী-গ্রামের ভালো মন্দের সঙ্গে জড়িত। আর তাকে কোনক্রমেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, যে-সমস্ত মানুষের শহরে বসবাস করে ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে উঠেছে তারা গ্রামের মানুষদের ছোটলোক বলে গণ্য করতেন এবং নিজেদের মনে করতেন গ্রামের মানুষদের থেকে আলাদা-গোত্রের মানুষ। ফলে গ্রাম ও শহরের তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। যা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে তো বটেই বর্তমানের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। তাই 'পল্লীর উন্নতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে,

> "শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে।"[৫]

আবার 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন-

> "শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে আমরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই।"[৬]

আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন পল্লীর সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্যক ভাবে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে। কেননা, তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আশা করেছিলেন যে, যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটালেই- গ্রামের মানুষেরা নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে-

> "...এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপের হইলেও চলে, কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার

> পক্ষেও নেহাৎ ছোট হয়- দেহটাকে এক আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই-চারজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামি জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্ হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।"[৭]

শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পুরুষশ্রেণীর শিক্ষার কথা বলেন নি; নারীদের শিক্ষার কথাও বলেছেন। কেননা, নারীরা সমাজের অর্ধেকাংশ জুড়ে রয়েছে। তাই নারীরা অশিক্ষিত থেকে গেলে সমাজ পিছিয়ে পড়বে। যদিও তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিশেষ করে গ্রামসমাজে নারীশিক্ষার বিষয়টি ছিলো নানান বাধা ও নিষেধে ঘেরা। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের কল্যাণের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য নারীশিক্ষার প্রসারের কথা বারবার বলেছেন-

> "বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যা ব্যভারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কী?"[৮]

আমাদের দেশে শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিস্তারের বিষয়ে ব্রিটিশ-শাসকের অনীহা ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনাগ্রহকে কেবলমাত্র সমালোচনাই করেন নি; একই সঙ্গে রাশিয়া, জার্মানি, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শিক্ষাবিস্তারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কিভাবে এই দেশগুলিতে সরকার ও দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় দেশের শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে সফল হয়েছে তাও তিনি 'রাশিয়ার চিঠি'তে উল্লেখ করেছেন-

> (ক) "রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল সেখানকার যা চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায় যে আট বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনসাধারণের মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও আমাদের দেশে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয় নি।"[৯]
>
> (খ) "আমি নিজের চোখে না-দেখলে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ, ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে।"[৯ক]
>
> (গ) "এখানে রাশিয়ার সেই শিক্ষা কী আশ্চর্য উদ্দমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার প্রমাণ শুধু সংখ্যার নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়।"[৯খ]
>
> (ঘ) "এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্দ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম, তার অতি অল্প পরিমাণ (আমাদের দেশে) থাকলেও কৃতার্থ হতুম।"[৯গ]
>
> (ঙ) "জাপান এই শিক্ষার যোগেই অল্পকালের মধ্যেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে সর্বসাধারণের ইচ্ছা ও চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে, দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমান তুরস্ক প্রবলবেগে এই শিক্ষাকে অগ্রসর করে দিয়ে ধর্মান্ধতার প্রবল বোঝা থেকে দেশকে মুক্ত করার পথে চলেছে।"[৯ঘ]

রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে যে-ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ প্রসারের কথা ভেবেছিলেন, তারই বাস্তব রূপ তিনি রাশিয়ায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তবে রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ অভূতপূর্ব উন্নয়নের মধ্যে যে ছাঁচে-ঢালা যান্ত্রিকতা দেখেছিলেন; তাকে তিনি মনে-প্রাণে সমর্থন করেননি। তাই তিনি লিখেছেন-

> "এর মধ্যে যে গলদ কিছু নেই তা বলি নে; গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে- কিন্তু এরা ছাঁচে- ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকেনা-

> সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহলে হয় একদিন ছাঁচ ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।"[৯ঙ]

রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তা আমরা সকলেই জানি। রাশিয়ার এই ছাঁচের শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়েছিল একসময়ে।

ঘ. রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ :

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, অতীতে পল্লীবাংলার যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারত। কিন্তু শিক্ষিত-সমাজের কথা ও চিন্তা ভাবনার সঙ্গে তারা এখন আর নিজের ভাবনাচিন্তা ও বোধকে মেলাতে পারছেনা। লোকশিক্ষার এই সহজ মাধ্যমগুলির প্রচলনের অভাব তিনি অনুভব করেন। তাই তিনি পল্লীর মানুষের শিক্ষার জন্য-সচেতনতার জন্য পল্লীর প্রচলিত লোকশিক্ষার চিরাচরিত অবরুদ্ধ মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বললেন যে, যাত্রা-কথকতা-পাঁচালির মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক-পালা গেয়ে ও অভিনয় করে সাধারণ মানুষকে আনন্দ ও শিক্ষা প্রদান করা পারে; তেমনি দেশের ঐতিহাসিকও সামাজিক তথা লৌকিক গল্পও অভিনয় সেখানে করা যেতে পারে। ফলে দেশের বর্তমান ও অতীতের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সহজে শিক্ষিত করা সম্ভব—

> "কথা ও যাত্রার সাহায্যে সাধারণ মানুষ ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমনকি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে। ...যদি কোন কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচার ক্রিয়া দিবার ভারগ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস এমন কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।"[১০ক]

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে-আদর্শের কথা মনে মনে ভেবেছিলেন, তার ভিত্তি ও আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থায়। যেখানে শিক্ষাগুরু অরণ্যপ্রকৃতির মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ও মুক্ত-প্রাঙ্গণের মধ্যে বসবাস করতেন। ছাত্ররাও একই সঙ্গে গুরুর আশ্রমে বসবাস করত এবং দর্শন, চিকিৎসা, ধর্ম ও নীতিশিক্ষা প্রভৃতি যেমন শিখতো তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের নানান ধরনের কাজও করতো। এরফলে একদিকে ছাত্ররা যেমন বিশ্বপ্রকৃতির সংস্পর্শে থেকে দেহ-মনকে সরস-সতেজ রেখে শিক্ষা লাভ করতো; তেমনি গুরু তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে চিন্তা ও কল্পনার বিস্তার ঘটাতে পারতো এবং শিক্ষাকে ও কর্মকে আনন্দময় করে তুলতো। পাশাপাশি গুরুর অধ্যায়ন, আচার-আচরণ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রভৃতির দ্বারা ছাত্ররা মনুষ্যত্বের শিক্ষা তথা যথাযথ শিক্ষা লাভ করতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

> "সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপ নায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"[১০খ]
>
> "যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক, এই জমি হইতে বিদ্যাল্যের প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ, ঘি প্রভৃতির জন্যে গরু থাকিবে এবং গোপালনে চাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে। অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে।

তাহাদের শিক্ষার কতক অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র পরিচয়ে, সংগীত চর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ এটাও বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষাব্যবস্থার পরিসারের বিষয়ে যেমন শিক্ষার পরিবেশের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে; তেমনি রয়েছে যথার্থ শিক্ষকের আচার-আচরণ, চরিত্রের বলিষ্ঠতারও যথেষ্ট ভূমিকা। তাই রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাবিধি' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন-

"...শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। ...ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না।"[১২]

এর পাশাপাশি তিনি শিক্ষকের দ্বারা ছাত্রদের প্রতি শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে শ্রদ্ধার সুসম্পর্কের আবশ্যিকতার কথাও বলেছেন। কেননা, তিনি বিশ্বাস করেন যে, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। আর যেখানে শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই; সেখানে পারস্পরিক বিদ্যাশিক্ষার আদান-প্রদানের সম্বন্ধও কলুষিত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের বিনয়ী ও ধৈর্যবান হওয়ার বিষয়টি তিনি আরও গুরুত্বসহকারে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষক হবেন ধৈর্যবান এবং স্নেহপরায়ণ; তিনি ছাত্রদের নানান চাপল্যকে ক্ষমা করবেন। এমনকি, ক্লাসের সময় ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আলোচনা-তর্কবিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রদের যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-সৃজনক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশে সহায়তা করবেন এবং ছাত্রদের ভালোবাসবেন। আর ছাত্ররা যদি অপরাধ করে, তবে তারা নিজেরাই তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। এর ফলে ছাত্রদের ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হবে।

ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা-শক্তি তথা সৃজনশীলতার বিকাশের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই ছাত্রদের বাংলাসাহিত্য, বাংলাদেশের ভূগোল-ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি পড়ানোর বিষয়টি নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন যে-

"ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গওড়া হইতেই বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।"[১৩]

তবে একথা অবশ্য ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, সৃজনক্ষমতা, কল্পনাশক্তি প্রভৃতির বিকাশ ও শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য-বিধানের উপায় হিসাবে বাংলাসাহিত্য ও বাংলাভাষায় রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি পাঠের পরামর্শ দিলেও একথা ভুলে গেলে ঠিক হবেনা যে, সেই সময়ে এই-সমস্ত গ্রন্থাবলী ছিল খুবই দুর্লভ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে'র সভায় ছাত্রদের তথা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের তিনি অনুরোধ করেছেন-বাংলাসাহিত্য, বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষার তুলনামূলক ব্যকরণ, বাংলার ঐতিহ্য-ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের পরিচয়-সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনার জন্য তথ্যসংগ্রহ করতে। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষার আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন-আশ্রম বিদ্যালয় তথা বিশ্বভারতীতে এবং অবশ্যই শিক্ষাসত্রে। তবে রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টার নানান পরিকল্পনা ও উদ্যোগ সত্ত্বেও শিক্ষাসত্রের শিক্ষার আদর্শ গ্রামবাংলার মানুষের কাছে যথার্থভাবে পৌছায়নি। এই কারণেই বোধহয় দেশের সম্পদ-ঐতিহ্য রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে মানুষের তেমন জোড়ালো আগ্রহ দেখা যায়নি। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশিত শিক্ষার মূল-আদর্শ তথা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন আজও পুরোপুরিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেনি।

আসলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত শিক্ষা কখনোই মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ঘটায় না। দেশ ও জাতির সঙ্গে তথা সামগ্রিকভাবে মেলবন্ধনের মাধ্যম হলো শিক্ষা। আর তা অবশ্যই মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিপূর্ণতার

শিক্ষা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মানবিকতার শিক্ষা। কিন্তু দেশের তথা কথিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা যে-শিক্ষা লাভ করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের মতে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাঁর মতে বিদ্যা আর শিক্ষা এক নয়। বিদ্যা আহরণের বিষয় বা বস্তু; আর শিক্ষা হল মানুষের আচরণের বিষয়। কাজেই পুঁথি পড়ে কিছু বিদ্যা আহরণ করলেই তা শিক্ষা হয় না। শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যার চেয়ে শিক্ষার স্থান অনেক উঁচুতে। তিনি এই কারণেই সারাজীবন ধরে বিদ্যার কথা কমই বলেছেন; বলেছেন সর্বদা শিক্ষা কথা। যদিও শিক্ষার জন্য কিছু বিদ্যার প্রয়োজন থাকলেও; একথা সত্য যে, বিদ্যালাভ করলেই যথাযথ শিক্ষা লাভ হয় না। বিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা ধাতস্থ হয়ে আচরণের মাধ্যমে মানবিকগুণ প্রকাশ করলেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয়।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্র রচনাবলী, 'শিক্ষার মিলন', জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, একাদশ খন্ড, বিশ্ববভারতী গ্রন্থ বিভাগ, পৃ. ৬৯৭
২. সিংহ, দীক্ষিত, 'রবীন্দ্রনাথের পল্লিপুনর্গঠন-প্রয়াস', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৩৭-৩৮
২ ক. তদেব
২ খ. তদেব
২ গ. তদেব
২ ঘ. তদেব
২ ঙ. তদেব
২ চ. তদেব
২ ছ. তদেব
৩. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, শিক্ষাচিন্তা', গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৮৬
৪. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, 'শিক্ষার বাহন', তদেব, পৃ. ১৫৯
৫. রবীন্দ্র রচনাবলী, 'পল্লীর উন্নতি', ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষীকি সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫০২
৬. 'শিক্ষার বাহন', তদেব, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৪০
৭. 'লোকহিত', তদেব, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ২২৮
৮. 'স্ত্রী-শিক্ষা', তদেব, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৩৩
৯. রবীন্দ্র রচনাবলী, 'রাশিয়ার চিঠি', দশম খণ্ড, জন্মশতবার্ষীকি সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭২৫
৯ ক. 'রাশিয়ার চিঠি', তদেব, পৃ. ৭০৭
৯ খ. 'রাশিয়ার চিঠি', তদেব, পৃ. ৬৭৬
৯ গ. 'রাশিয়ার চিঠি', তদেব, পৃ. ৬৮২
৯ ঘ. 'রাশিয়ার চিঠি', তদেব, পৃ. ৭০৮
৯ ঙ. রবীন্দ্র রচনাবলী, 'রাশিয়ার চিঠি', পত্র-১, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থ, পৃ. ৫৫৬
১০. ক. 'ইতিহাস কথা', 'ভাণ্ডার' পত্রিকা, আষাঢ়, ১৯০৫
১০. খ. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯
১১. রবীন্দ্র রচনাবলী, 'শিক্ষার সংস্কার', একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষীকি সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৫৬৬
১২. 'শিক্ষাবিধি', তদেব, পৃ. ৬২৫
১৩. 'বিশ্বভারতী', তদেব, পৃ. ৭৪৮